জগৎপুরের ভগবান

অমর মিত্র

ভগবান আছেন কি না এ নিয়ে কতরকম কথা হয় আশপাশে। কেউ বলে নিশ্চিত আছেন, কেউ বলেন ওসব সত্যি নয়। এই জগৎপুরের গৌড়ের মণ্ডল--- আড়ালে যে গৌড়ের মাতব্বর, সে বলে, ভগবান না থাকলে এসব হয় না।
গৌড়েরের সামনে ভাঙা মোড়ায় বসে কালকাতা থেকে আসা আনন্দবাবু চায়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, যার যা বিশ্বাস।
না দাদা, তিনি আছেন।
আনন্দ একটি বাড়ি করেছে এখানে। অফিসের লোন, জমাটাকার কিয়দংশ, বউয়ের গয়না বন্ধক -- সব দিয়ে তবে কিনা একতলা একটি বাড়ি খাড়া করতে পেরেছে সে। মেঝেয় মোজাইক, দেওয়ালে প্লাস্টার অব প্যারিস, টয়লেটে মার্বেল পাথর, টাইলস -- এসব করে কম খরচ হয়নি তার। বাকিও আছে অনেক। রং করা হয়নি বাড়ি, জলের পাম্প লাগানো হয়নি। ছাদে জলের ট্যাঙ্ক বসানো হয়নি, পাঁচিল দেওয়া হয়নি। আর আনন্দর আসাও হয়নি। দেখতে দেখতে বছর পাঁচ পার হয়ে গেল, আনন্দ সপরিবারে এখনও এসে পৌঁছোতে পারেনি। সেই কবে তিনদিন থেকে শাস্ত্রমতে গৃহপ্রবেশ সম্পূর্ণ করেছিল, তারপর আসাই হচ্ছে না। যেমন ভেবেছিল, ঠিক তেমন হচ্ছে না জায়গাটা। চারদিকে ডেভলপমেন্টের জোয়ার, কিন্তু বাস রাস্তা থেকে তার বাড়ি অবধি যে বিশ - পঁচিশ মিনিট হাঁটা ভেড়ির গা ঘেঁষে পড়ে থাকা ভাঙাচোরা পথ দিয়ে, তার কোনো পরিবর্তন হল না।
আনন্দ আক্ষেপ করে বলল, অটো সার্ভিসটাও যদি হত ---
গৌড়ের চায়ের কাপ রেখে বলল, হবে কী করে, চাপবে কারা?
কেন সবাই।
গৌড়ের বলল, আপনারা চাপবেন, জগৎপুরের লোক সাইকেলে যাতায়াত করে অভ্যস্ত, আর এই ধন আমি, হেঁটে মেরে দিই, এই টুকুন তো পথ, তার জন্য অটো লাগবে কেন?
আনন্দ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় গৌড়েরের কথায়। লোকটার একটা অভ্যাস সব সময় অন্যের কথা কেটে দেয়। যা আছে তার পক্ষেই কথা বলে। বড়ো রাস্তা থেকে গলিপথে ঢুকতে হয় আনন্দর বাড়ি পৌঁছোতে গেলে। তার বাড়িরই উলটো দিকে গৌড়েরের বাড়ি। এই রাস্তায় এখনও জলকল এসে পৌঁয়োয়নি। তাতে কোনো আক্ষেপ নেই গৌড়েরের, বলে, টিউকল তো আছে দাদা, সাপ্লাই জল কী দরকার, হবেই বা কী?
তাই বলে মিউনিসিপ্যালিটির সাপ্লাই থাকবে না?
না থাকলেও তো চলছে, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী?
আনন্দ বলে, পিটিশন দিতে হবে, সবাই সই করে চেয়ারম্যানের কাছে দিয়ে আসতে হবে।
দিতে পারেন, কিছু হবে না।
বাহ্ হবে না কেন?
কতবার এইরকম করা হয়েছে, ওরা শুধু বলে সময়ে হবে।
এটা তো ঠিক নয়, সময়ে হবে মানে?

সময়েই হবে দাদা, সময় না হলে কিছু হয়?
আনন্দ কেমন যেন হতাশ হয়ে যাচ্ছে। কবে সময় হবে? ছেলেবেলায় শুনত সময় না হলে বিপ্লব হবে না, বিপ্লবের জন্য জনগণ প্রস্তুত নয়। তারপর কত বছর কেটে গেল, আনন্দর এখন পঞ্চাশ ছুঁয়ে গেল প্রায়। বিপ্লবের ক্ষেত্রে সময় তার জীবদ্দশায় আসবেইবলেও মনে হচ্ছে না। এমন যদি হয় জগৎপুরের ক্ষেত্রে। সময় তার জীবদ্দশায় আসবেই না।
গৌড়ের বলল, সবই উপরওয়ালার ব্যাপার দাদা। সবই কপাল, সবই ভগবানের ইচ্ছে, আপনি আমি হাজার চেষ্টা করলেও কিছু হবে না।
বাহ, তাই বলে চেষ্টা করতে হবে না?
হবে দাদা, কিন্তু সে-ও ভগবানের ইচ্ছেয় হবে, নাহলে দেখবেন আপনি দরখাস্ত লিখছেন, সই করার লোক পাচ্ছেন না, সই করিয়ে জমা যদিও বা দিলেন তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে চলে যাবে।
আনন্দ বিরক্ত হয়। এই লোকটা সবসময় তাকে নিৎসাহ করে। কী অদ্ভুত লোক, কখনোই চায় না এখানে ডেভলপমেন্ট হোক। তার বাড়ির পিছনে দুশো মিটার দূরে খোলা মাঠের ভিতরে সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছে বড়ো একটা রাস্তার জন্য। সেই রাস্তা আসবে ভি আই পি রোড থেকে, কোণাকুনি পৌঁছে যাবে ই এম বাইপাস-এ। রাস্তার কথা অনেক দিন ধরে শুনছে আনন্দ, কিন্তু রাস্তার কাজ আর আরম্ভহচ্ছে না। রাস্তাটা হয়ে গেলে রাতারাতি জগৎপুর বদলে যাবে। তার বাড়ির পজিশনও ভালো হয়ে যাবে। সে গৌড়েরকে জিজ্ঞেস করল, রাস্তার খবর কী?
কোন রাস্তা?
বাইপাস রাস্তা।
গৌড়ের হাসে, বাইপাস রাস্তা, কেন করবে?
সে তারা জানে।
আপনি শুনে রেখে দেন দাদা ও রাস্তা কোনোদিনই হবে না।
কেন হবে না?
খালের উপর ব্রিজ করতেই আটকে যাবে, জলপথ আইন আছে একটা তো জানেন? সেই আইনে কাছাকাছি দুটো ব্রিজ হতে পারে না।
আনন্দ বলল, তাহলে যে জমি নিল?
নিয়েছে আবার ফেরতও দিয়ে দেবে।
ফেরত দেওয়ার জন্য নেয়?
নেয় দাদা, গরমেন্টের সব আমলা, কর্মচারী, অনেক টাকা মাইনে, কাজ দেখাতে হবে তো, এই ধন নীলগঞ্জে আমার শ্বশুরঘর, সেখেনেও নাকি জমি নোটিশ করা আছে বিশবছর, কোনো কাজ এগোয়নি, আর এগাবেও না, মাইনে নেবে মোটা মোটা, এরকম প্ল্যান না দিলে চলবে কেন বলুন?
মাথা নাড়ে আনন্দ, বলে, এটা হতে পারে না। এই রাস্তার প্ল্যানও আমি দেখেছি পি ডব্লু ডি অফিসে গিয়ে, রাস্তা হবেই।
ফুৎকারে তার কথা উড়িয়ে দিয়ে গৌড়ের বলল, প্ল্যান দেখে কিছু বোঝা যায়, নাকি প্ল্যানে প্রমাণ হয় যে রাস্তা হবে, না, হতে পারে না, আমি পঞ্চাশ বছর ধরে শুনছি এই হবে, ওই হবে, কিছুই হল না, আর হয়েও তেমন লাভ নেই।
কেন, লাভ নেই বলছেন কী করে?
রাস্তা হলে আমাদের কী?
রাতারাতি জায়গাটা বদলে যাবে।
বদলে গেলে আমাদের কী হবে?
বাহ্, ধন ভি আই পি রোড হওয়ার আগে কেষ্টপুর, বাগুইআটি কেমন ছিল মনে করে দেখুন তো।
গৌড়ের সিগারেট বের করল তার ফতুয়া পকেট থেকে। সবচেয়ে কমদামি অদ্ভুত এক প্রাচীন ব্র্যান্ডের সেই কাঁচি সিগারেটযে এখনও পাওয়া যায় তা জানতই না আনন্দ। এখানে এসে দেখেছে। বারোকপাটেই সিজার, পার্শিশো, উইন্ডসর সিগারেট মেলে, টেক্কা মার্কা, ব্যাগ মার্কা দেশলাই মেলে। কোথা থেকে আসে এসব? দোকানদার জানে। দোকানদারের

কাছে খোঁজ নেবে নেবে করে নেওয়া হয়নি। একদিন কাঁচি সিগারেট নিয়ে ধোঁয়া টেনে মুখ কীরকম বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল সিগারেটটিও যেন পঞ্চাশ বছর আগের। তার তামাকে সোঁদা গন্ধ ধরে গেছে, ছত্রাক জন্মেছে।
ধোঁয়া ছেড়ে গৌড়ের বলল, ডাকাতি বাড়বে।
তার মানে?
ডাকাতের সুবিধে হবে, আর বাইরের লোক এসে ফ্ল্যাটে বাস করার ফল হল পাশের ফ্ল্যাটের লোককে আপনি চিনবেন না।
ওটা কথার কথা
না ওটাই সত্যি কথা দাদা, ওই যে খুনিটার বিচার চলছে, নির্মল কুণ্ডু ওর পাশের ফ্ল্যাটে থাকত আমার বড়ো ছেলের কলিগ, তারা জানতই না যে নির্মল ওইরকম ছেলে।
এ কি জানা সম্ভব।
জগৎপুরে জানা সম্ভব, কে কার সঙ্গে দেখা করছে তা-ও কারোর চোখ এড়ায় না দাদা, আপনি চলে আসুন, ভালো থাকবেন।
যাতায়াত করব কী ভাবে?
সাইকেলে যাবেন বাসস্ট্যান্ড।
কিন্তু আমার মিসেস, আমার মেয়ে
তাঁরা তো কালেভদ্রে বেরোবেন, রিকশা আগে থেকে বলে রাখলে হবে।
প্রত্যেকদিন বেরোয়, কালেভদ্রে হবে কেন?
গৌড়ের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, প্রত্যেক দিন বেরোনোর কী দরকার দাদা, যায় অবশ্য এদিকের মেয়েরাও, আরও গাঁয়ের দিকের মেয়েরাও জগৎপুর পার হয়ে কলকাতার দিকে চলে যায়, আয়ার কাজ করে ঝি গিরি করে, রান্নার কাজ করে, কিন্তু তারা সব গরিব ঘরের, চাষবাস চলে যাচ্ছে, করবে কী?
আনন্দ বলল, আমার মেয়ের কলেজ আছে, তারপর কমপিউটার শেখা আছে, কোচিং আছে, ফিরতে তো রাত আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়।
সে তো অনেক রাত, শেষ বাস ছেড়ে যায় সাড়ে আটে।
শেষ বাস কখন ঢোকে? আনন্দ জিজ্ঞেস করে।
বোধহয় পৌনে দশটায়, তারপর হেঁটে আসতে হবে, ও খুব অসুবিধে হবে আপনার খুকির। বলে গৌড়ের তার মাথার কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালায়, বলে, আপনাকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বাসস্ট্যান্ডে।
আমি তো আরও পরে ফিরি।
গৌড়ের হাসে, তাহলে দেখুন, বাস যখন ছিল না তখনও তো মানুষ ছিল, সাইকেলে কিংবা হেঁটেই কাজ চলত, মেয়েরা বেরোতই না, না বেরিয়েও তো জীবন চলত, কুড়ি মিনিট হাঁটাপথে ভেড়ির ওপারে বাস চালু হয়ে জগৎপুরের কোনো লাভ বয়নি, বরং বাসে চেপে খারাপ লোক ঢুকে পড়ছে এদিকে।
আমি খারাপ লোক? আনন্দ বুকে হাত দিল।
না, না আপনি খারাপ হবেন কেন, ওটা কথার কথা, বলছি বাসস্ট্যান্ডটা কীরকম অন্ধকার হয়ে থাকে দেখেছেন?
দেখেছি, আলো দেয় না কেন?
ওই যে খারাপ লোক যায় আসে তাই। ওরা ইচ্ছে করেই ওখানে আলো জ্বালায় না, ওখান থেকেই কলকাতায় যাওয়ার রাস্তা আরম্ভ জায়গাটা খারাপ করে দিচ্ছে।
আপনারা কিছু বলুন, প্রটেস্ট কন।
আমাদের কথা শুনবে না, কেন শুনবে, শুনে ওদের লাভ?
তাহলে আমি আসব কী করে জগৎপুরে?
হাসল গৌড়ের, বলল, আপনি একটা কাঁচি ধরান, টেক্কা দেশলাই-এ আগুন নিন, তখন দেখবেন সব ভালো, কী করে অ

াসবেন কেন আসবেন তা মনেই হবে না, জগৎপুরে জমি কিনেছেন,, বাড়ি করেছেন তাই আসবেন।
কিন্তু থাকব কী করে?
হে হে করে হাসে গৌড়ের, বলে যেভাবে ভগবান থাকেন।
ভগবান থাকেন মানে?
ভগবান তো আছেন।
আছেন কি নেই তা আপনি জানেন, কিন্তু আমি তো সামান্য মানুষ, আমি থাকব কী করে, আমাকে বেরোতে হবে ফিরতে হবে, রাস্তাঘাটও হল না, বাসও ঢুকল না, জলও সাপ্লাই নেই ---
এখনো কি মানুষ থাকে না?
থাকবে না কেন, কিন্তু ---। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড্ডো তক্কো করে গৌড়ের। মঙ্গল না মাতববর। এখানে এলে কেমন হতাশ লাগে তার। অত কষ্ট করে করা বাড়ির ভিতরে তারই রেখে যাওয়া পালঙ্কে, গদির উপর গৌড়ের চিত হয়ে শুয়ে থাকে, মাথার উপর তারই রেখে যাওয়া হাইস্পিড পাখা বনবন করে ঘোরে, সন্ধেয় দখিনখোলা জানালা দিয়ে হু হু করে সামুদ্রিক বাতাস ঢুকে পড়ে, কী সুখ! এই সমস্ত সুখ আনন্দেরই পাওয়ার কথা, ছাদের উপর ইজিচেয়ারে বসে তারা গোণার কথা তারই, কিন্তু হয়ে উঠছে না। এমন মনে হচ্ছে এই গৌড়ের মঙ্গল-মাতববরের জন্যই যেন তার জমি খোঁজা, লোন নেওয়া, বাড়ি করা। গৌড়েরের বাড়ির ছাদ পাকা না, ছিরিছাঁদ নেই, কোনোরকমে পাকা দেওয়াল, তার উপর টালির চাল। লম্বা সরু বারান্দা, ভিতরে শোয়া - বসার জায়গা নেই তেমন, আনন্দর নতুন বাড়ি তার এই শেষ বয়সে নতুন সুখ এনেছে সত্যি। এখন যদি সত্যি এ জায়গা ডেভলপ করে যায় আনন্দ তো পরিবার নিয়ে চলে আসবে। গৌড়েরের তখন কী হবে?
হতাশ আনন্দকে দেখে গৌড়েরের যেন মায়া হল, বলল, আপনি আজ এখানে আসছেন না, কাল আপনাকে আসতে হবেই, বাড়ি যখন করেছেন না এসে পারবেন?
আসব বলেই তো বাড়ি করা।
সে কি আমি জানি না, চলে আসুন না তাহলে।
অসুবিধেটা বুঝতে পারছেন না?
গৌড়ের বলল, কোনো অসুবিধে হবে না, জগৎপুরে এসে জগৎপুরের মানুষের মতো হয়ে যাবেন চন্দ্রবাবু, এখানকার মানুষদের তো ভগবান খারাপ রাখেননি।
ভগবান! আনন্দ হালল, মনে মনে বলল, ভগবান আমার জন্য ওই পুরোনো, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ফ্ল্যাটেই বরাদ্দ করেছেন যে তা এখন ধরতে পারছি। মুখে বলল, রাস্তা কিন্তু হবেই, শোনা যাচ্ছে টেন্ডার হয়ে গেছে।
গৌড়ের পিঠ চুলকোয় একটু বেঁকে। এখন চৈত্রমাস। বেলা পড়ে এসেছে। কীরকম পাগল পাগল বাতাস ঘুরছে, পাক মারছে জগৎপুরের শূন্যতায়। আহা কী সুন্দর বেলা। এখন একা একা বসে কত স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কথা ভাবা যায়। সে-ও তো কম সুখ নয়। তার উত্তর কলকাতার বাসস্থানে অমন হয় না। কলকাতায় মধুমাস টেরই পাওয়া যায় না। মধুমাস না এসে কলকাতা স্মৃতিবিধুর হয়ে উঠবে কী করে তার কাছে?
গৌড়ের বলল, তিনদিন তিনরাত্রি, চবিবশ প্রহর হরিনাম কীর্তন হবে, পাঁচুড়ে ধর্মতলা থেকে কৃষ্ণভামিনী আসবে, তার গলা শুনেছেন?
না, কী করে শুনব?
চোখের জলে ভাসিয়ে দেবে, বুড়ি - বুড়োরা পর্যন্ত তার কীর্তনে পাগল হয়ে যায়, আপনি সত্যিই শোনেননি, আশ্চর্য!
কী বলবে আনন্দ? সে তার নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল। জগৎপুরে থেকে বুড়ো হয়ে কোনো এক কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণনামে আত্মহারা হয়ে অশ্রুপাত করছে আনন্দ চন্দ্র চন্দ্র। কৃষ্ণভামিনী কে? গৌড়ের বলল, কালোর ভিতরে কী রূপ তার, তার আর এক নাম কালোশশী, যৈবন কী, গানের নেশায় কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে আলাপও হবে, যার সঙ্গে থাকে সে একটা বুড়ো কিন্তু টাকার কুমির, তিনটে ইটভাটার মালিক, দুটো মেছোঘেরিও আছে, কী বুঝলেন?
আনন্দ ভাবল এ বাড়িতে সে কি আর আসতে পারবে? যদি আসে তাহলে কি আর কলকাতায় ফিরতে পারবে? আচ্ছা না ফেরেই যদি কলকাতায়, কী হতে পারে? সে হয়তো কৃষ্ণভামিনীর পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল পাঁচুড়ে ধর্মতলা, চাঁদপুর,

শিখরপুর - যে কথা বলছে গৌড়ের। সে নিজে নাকি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল প্রথমবার কৃষ্ণভামিনী দাসী কীর্তনীয়াকে দেখে। চাপা গলায় বলছে, আসুন না, জগৎপুরের রূপ দেখতে পাবেন তখন।
কী রূপ?
আসুন না, যেমন গানের গলা তেমনি রূপ, আপনারে সে খাতির করবেই।
আনন্দ চুপ করে থাকে। গৌড়ের মাতববরের ইঙ্গিত কি ধরতে পারছে না, কিন্তু বলার কিছু নেই। ভগবানের নাম করে কৃষ্ণভামিনীর এত খ্যাতি, বিরহিনী রাধার আকুল প্রার্থনা তার গলায় শুনতে পাবে আনন্দ, এর ভিতরে দোষ কোথায়? সে জিজ্ঞেস করে, কবে আরম্ভ?
দোলের তিনদিন আগে, দোলের দিন অধিবাস সম্পূর্ণ, থাকেন এখানে, আবীরে কুমকুমে রাঙা হয়ে যাবেন।
দোল কবে?
এও জানেন না চন্দ্র মশায়, আর ঠিক দশদিনের মাথায়, আজ পয়লা চৈত্র, এবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা চৈত্র মাসে।
এসব আমার ঠাকুমা বলত, দেশের বাড়িতে হত, সে তো অনেক অনেক বছর আগে, ছোটোবেলায় যখন পূর্ববঙ্গের কথা বলত ঠাকমা...।
সিজার সিগারেটের প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে ধরল গৌড়ের, বলল, এতে প্রমাণ হয় ভগবান আছেন।
কী করে প্রমাণ হয়?
না হলে কৃষ্ণভামিনীর গান শোনার সৌভাগ্য আপনার হবে কেন, দেখবেন তার গলার মালা যখন আপনার গলায় এসে পড়বে, খোলের বোল যেন কথা বলবে মশায়, আমিও খোলে চাঁটি মারব তখন।
কিন্তু ভগবান কোথায় থাকবেন?
জগৎপুরেই আছেন, জগৎপুরেই থাকবেন, আপনার বড়ো পাকা রাস্তা হলে, বাস ঢুকলে, অটো ঢুকলে কি কৃষ্ণভামিনী এদিকে আসবে আর? আসবে না, জগৎপুরে ভগবানও আর থাকবে না।
কিন্তু তিনি যে আছেন তাই বা কী করে বলছেন?
সিজার সিগারেটে আগুন নিয়ে গৌড়ের বলল, তিনি না থাকলে এবাড়ি হত না, তিনি না থাকলে আপনিও এখানে আসতেন না চন্দ্রবাবু।
আমার বাড়িটা নিয়ে আমি কী করব গৌড়ের মশায়?
থাকুক না, আছে তো।
মাসে মাসে চার হাজার টাকা লোন কাটছে, তার উপরেও যদি বাড়িটাকে না ভোগ করতে পারি --- আমার অবস্থাটা বুঝছেন?
ভোগ করার হলে ঠিক ভোগ করবেন, সবার জন্য সব ঠিক আছে মশায়।
আচমকা রাগ হয়ে গেল আনন্দর। লোকটার খুব সুখ। এক পয়সাও খসাতে হয়নি, ঢালাই ছাদের নীচে ঘুমোচ্ছে, নাতি কোলে দুলছে। এখন বলছে বাড়িটা রং করাতে। তার পয়সায় রং হবে, সে বাড়ি দেখবে এই গৌড়ের। ঋণ শোধ করতে জগৎপুরে এসেছে নাকি আনন্দ? সে উঠে দাঁড়াল, বলল, আমার বাড়ি আমি বিক্রি করে দেব।
অবাক হয়ে গেল গৌড়ের, বলল, হঠাৎ একথা?
কাজে লাগছে না
লাগবে, কিন্তু বিক্রি করলে খদ্দের দেখব আমি।
আনন্দ বলল, তাই হোক।
মাথা ঠাণ্ডা কন, দোলযাত্রায় তিন দিন আগে আসুন, হরিনাম কন, তারপর ঠিক করবেন রাখবেন কি রাখবেন না।
আপনি আগে বলতেন রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।
বাস ঢুকে যাবে, রাস্তা পাকা হবে, জল এসে যাবে ঘরে ঘরে।
গৌড়ের বলল, এতে প্রমাণ হল ভগবান আছেন, তিনি যদি না চান, জগৎপুরকে নষ্ট হতে না দেন, কথায় বলে না রাখে হরি মারে কে? তাই হয়েছে।

আপনি কি চান না আমি আসি?
গৌড়ের হেসে বলল, আপনি এলে তো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, আমি যাবও, কিন্তু না এলে তো যেতে হচ্ছে না।
মূহ্যমান আনন্দ চন্দ্র দেখল আলো কমে এসেছে। সন্ধে হয়ে এল প্রায় । তার বাড়ির পিছনের গাছগাছালিতে পাখিদের শেষ আলাপ শু হয়ে গেছে। এখন তাকে যেতে হবে। অন্ধকারে অনেকটা হাঁটতে হবে। তার আগে হৈ লোকটাকে---!
গৌড়ের বলল, এই বাড়িতে কৃষ্ণভামিনী বিশ্রাম নেবেন, তাঁর কপালে কুমকুমের টিপ, ঠোঁটে পানের রস, লাল টুকটুকে, বাসন্তী রঙের শাড়ি, লাল ব্লাউজের ভিতর ভরা দুই বুক, পায়ে আলতা, মাথায় চুল এলো, কী স্বাস্থ্য, ভরা কলসের মতো পাছা...আপনার মত আছে তো চন্দ্রমশায়?
তারপর?
গান গাইবে শুধু আপনার সামনে বসে।
তারপর?
গৌড়ের বলল, দোলপূর্ণিমার রাতে তার পিছু ধরেছিলাম আমি একা একা, সে বলে ঠাকুর তুমি যাও, আমি তার ছায়ায় য়ায়ায় হাঁটি।
তারপর?
অধৈর্য হচ্ছেন কেন চন্দ্রমশায়, আপনার পাকা রাস্তা, অটো রিকশা, জলকল, দোকানদানি, আইসক্রিম চকোলেটের চেয়ে কৃষ্ণভামিনী কম কিসে, অমন মধুর রূপ! তাকে কি কলকাতায় এজীবনে দেখতে পাবেন? জগৎপুরে বাড়ি করা হয়তো কৃষ্ণভামিনীর জন্য, ভগবান তো এমনও ভাবতে পারেন নিজে নিজে, আপনি আমি তাঁর মনের কথা জানব কী করে?

হয়তো তাই! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আনন্দচন্দ্র। এবার তাকে ফিরতে হবে। ফিরতে হবে আবার জগৎপুরে ফিরে আসার জন্য।এই দোলপুর্ণিমায় হতে পারে, তারপরের চৈত্রপূর্ণিমাতেও হতে পারে। সেদিন কৃষ্ণভামিনী থাকতেও পারে, নাও পারে। জগৎপুর তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গৌড়ের মাতববরের ভগবানের ইচ্ছে হয়তো এই রকম। এতে তো একটা ব্যাপার ধরা যায় ভগবান আছেন সত্যি। কোথাও না হলে এই জগৎপুরে। না হলে গৌড়েরের জীবন এত মধুময় হয় কী করে? বয়স তো কম হল না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com